জাদুঘরের সংগ্রহ থেকে

শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর পাঞ্জাবি

স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে হত্যাযজ্ঞের সূচনা করেছিল, একেবারে শেষ দিকে এসে পরাজয়ের আগমুহূর্তে তা রূপ নেয় দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তখন তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় বেছে বেছে হত্যা করেছিল জাতির অগ্রণী শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিকিৎসকদের। এসব হত্যার কারণটি স্পষ্ট, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা চেয়েছিল স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়া দেশটিকে মেধায়-মননে পঙ্গু করে দিতে।

জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, যাঁদের আমরা হারিয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বিজয়ের ঠিক আগমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে একজন হলেন শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী। তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী (২৭ নভেম্বর ১৯২৫ ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রি.)। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, ভাষাবিজ্ঞানী ও বাগ্মী। তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সকল পর্যায়ে তাঁর সরব উপস্থিতি ছিল। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি মুনীর চৌধুরী সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুনীর চৌধুরী ফিরে আসার কিছুকাল পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি পাকিস্তান সরকারের দেওয়া সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৬) খেতাব বর্জন করেন। ২৬ মার্চ ঘোষণা করা হলো স্বাধীনতা। শুরু হলো সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর কাঙ্খিত স্বাধীনতা যখন বাঙালীর দোড়গোড়ায়, যখন স্বাধীনতা অর্জনের আর মাত্র ২ দিন বাকি, জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, যাঁদের আমরা হারিয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বিজয়ের ঠিক আগমুহূর্ত পর্যন্ত, তখন আরো অনেকের মতো ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী আল- বদর বাহিনী তাঁর বাবার বাড়ি থেকে অপহরণ করে ও সম্ভবত ঐদিনই তাঁকে হত্যা করে।

এই মহান আত্মত্যাগী বাঙালির ব্যবহৃত পাঞ্জাবি শহিদ পরিবারের পক্ষ থেকে জাদুঘরকে প্রদান করেছেন তাঁর সন্তান আসিফ মুনীর।

শহিদ বুদ্ধিজীবী শহিদুল্লাহ কায়সারের ডায়রি

শহীদুল্লাহ কায়সার (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭ - মৃত্যু : ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রি.) সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি ছিলেন সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা। ভাষা আন্দোলনের সময় নিষিদ্ধ বাম পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যথারীতি যোগাযোগ রাখতেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠলে সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সারা ঢাকা শহরের মানুষ ঘর বাড়ি ছাড়তে শুরু করে। তখন শহিদুল্লাহ কায়সার জীবন বাজি রেখে ঢাকাতেই অবস্থান করেন। শুধু তাই নয়, অনেককে ঢাকা থেকে নিরাপদে চলে যেতেও সহায়তা করেন। তাঁর দেশত্যাগ না করার আরও একটি কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ ইতিহাস নিজে প্রত্যক্ষ করে তা ইতিহাসে বিধৃত করার ইচ্ছা। কিন্তু হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর আলবদর বাহিনীর সদস্যরা তাঁকেই ইতিহাসে পরিণত করেছেন। বিজয় লাভের মাত্র দুই দিন আগে ঘাতকরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফিরে আসেননি আমাদের মাঝে। এমনকি তাঁর মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। এই প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীর অপ্রকাশিত ডায়রি **১৯৭১ :** গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরকে প্রদান করেছেন শহিদের কন্যা শমী কায়সার।

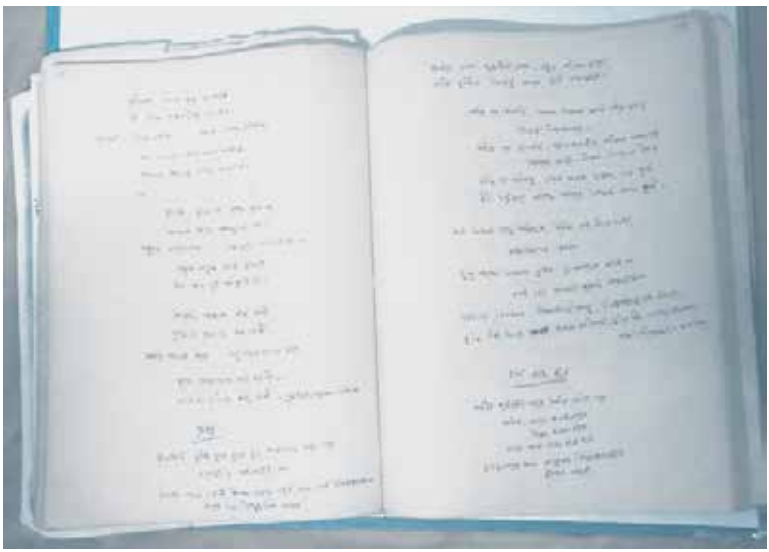

শহিদ বুদ্ধিজীবী এ এফ এম আবদুল আলীম চৌধুরীর চিকিৎসা সরঞ্জাম

এ এফ এম আবদুল আলীম চৌধুরী (১৯২৮-১৯৭১) চিকিৎসক ও শহীদ বুদ্ধিজীবী। পুরো নাম আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ আবদুল আলীম চৌধুরী। জন্ম ৩ বৈশাখ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৮ সাল) কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম থানার

খয়েরপুর গ্রামে। পিতা আবদুল হেকিম চৌধুরী এবং মাতা সৈয়দা ইয়াকুতুন্নেছা। আলীম চৌধুরী ১৯৫৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি এবং ১৯৬১ সালে ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জনস থেকে ডিপ্লোমা ইন অপথালমোলজি ডিগ্রি লাভ করেন।

আলীম চৌধুরী ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে এবং ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাস-ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের চিকিৎসাসহ ত্রাণকাজে অংশগ্রহণ করেন।

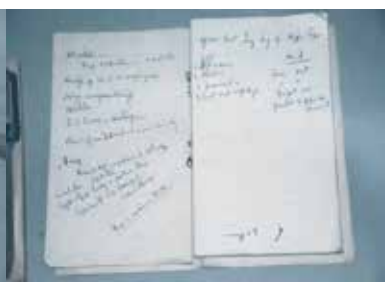

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন এবং তাদের জন্য ঔষধ সরবরাহ করতেন। এটাই হয়তো ছিলো তাঁর অপরাধ। যে কারণে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া মওলানা আবদুল মান্নান এর সহায়তায় ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানী হানাদারদের দোসর আলবদর সদস্যরা তাঁকে ঢাকার পুরানো পল্টনের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। বিজয়ের পর ১৮ ডিসেম্বর রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে আরও অনেকের সঙ্গে আবদুল আলীম চৌধুরীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায়। আলবদর মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ এই চিকিৎসককে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই অকুতোভয় চিকিৎসক আলীম চৌধুরীর চিকিৎসা সরঞ্জাম জাদুঘরকে প্রদান করেছেন শহিদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী। সরঞ্জামগুলোর মধ্যে রয়েছে ল্যাম্প, তুলার প্যাড, ফরসেপ, ব্যান্ডেজ, ঝাঝরি, কটনবাড, কেঁচি, স্ট্যাম্প, সিরিঞ্জ, ডায়রি, কলম ও ভিজিটিং কার্ড।

শহিদ বুদ্ধিজীবী সেলিনা পারভীনের কলম ও শাড়ি

বিজয়ের সন্ধিক্ষণে যখন বাংলাদেশ, তখন অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে বাড়ি থেকে ধরে এনে বিভিন্ন টর্চার সেলে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন জনবিরল স্থানে সেসব লাশ ফেলে দেওয়া হয়। এমনই একটি বেদনাময় ঘটনার শিকার হন সেলিনা পারভীন।

১৯৬৯ সালে তাঁর একক প্রচেষ্টায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয় শিলালিপি পত্রিকা। ছবি আঁকা, সঙ্গীত চর্চা, ব্লক তৈরি এবং ডিজাইনের কাজে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর শিলালিপি পত্রিকার প্রচ্ছদ ও বিভিন্ন রচনা পাকসেনাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকারদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে সময়ে তিনি ঢাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা দিতেন। তাঁর এসব কর্মকাণ্ড শত্রুর জন্য বিপদজনক ছিল বলেই আল-বদরদর সদস্যদের তালিকায় তাঁর নাম উঠে

আসে। সেদিন ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। দেশ শত্রু মুক্ত হতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। কোনো কোনো অঞ্চল ইতিমধ্যে মুক্ত হয়ে গেছে। সেলিনা পারভীন তখন ছিলেন ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বাসভবনে। কয়েকজন লোক মুখে রুমাল বেঁধে প্রবেশ করে তাঁর বাড়িতে। ধরে নিয়ে যায় সেলিনা পারভীনকে। তিনি আর ফিরে আসেননি। পরে ১৮ ডিসেম্বর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তাঁর চোখবাধা মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্রখ্যাত এই সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী যে কলম দিয়ে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করেছেন সেই কলম এবং তাঁর পরনের শাড়ি আজ সংরক্ষিত হচ্ছে ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরে। আর্কাইভ ও জাদুঘরে এটি প্রদান করেছেন শহিদের একমাত্র সন্তান প্রয়াত সুমন জাহিদ।

শহিদ বুদ্ধিজীবী নিজাম উদ্দিন আহমদের কোট

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সারারাত নিজাম উদ্দিন আহমদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাটান। ভোরের আলো ফোটার আগেই তিনি একটা ছোট ট্রানজিস্টার নিয়ে বাইরে যাবার জন্য তৈরি হন। স্ত্রী রেবা তাঁকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজাম উদ্দিন আহমদ বলেন, 'এখন কি ঘরে বসে থাকার সময়?' আমাকে বাইরে গিয়ে দেখতে হবে কোথায় কী হলো; তাছাড়া আমার অফিসে টেলিপ্রিন্টারের অপারেটর ও অন্যান্য লোকজন আছে, তাদের খোঁজ নিতে হবে।' এই বলেই তিনি বেরিয়ে যান। সারাদিন ঘুরে দেখেন ঢাকা শহরে পাকবাহিনীর বর্বরতা। মৃত্যু উপত্যকায় দাঁড়িয়েই তিনি সংগ্রহ করেন গণহত্যার সংবাদ। আবার যথাসময়ে সেগুলো পাঠিয়েও দেন বিভিন্ন

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিবিসি'র সংবাদদাতা হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর এই সংবাদ পাঠানোর জন্যই নিজাম উদ্দিন আহমদ পাকিস্তানি ঘাতকদের রোষাণলে পড়েন, তাই তাঁকে হত্যা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস যিনি নির্ভীক সৈনিকের মতো নানা জায়গায় ঘুরে খবর সংগ্রহ করেছেন এবং বিবিসি'র মাধ্যমে তা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাত্র চারদিন আগে সেই নিজাম উদ্দিন আহমদ নিজেই পরিণত হলেন খবরে। নিজাম উদ্দিন আহমদ যে যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে নির্ভীকভাবে রিপোর্ট করছিলেন সেই যুদ্ধে বাংলাদেশিদের বিজয়ের খবর বিশ্ববাসীর কাছে তিনি পাঠাতে পারেননি। এর আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আলবদরদের সহায়তায় তাঁকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর ব্যবহৃত কোট আজ সংরক্ষিত রয়েছে ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরে। প্রদান করেছেন শহিদের পরিবার।